ঠিক কতক্ষন গাড়ী চালিয়েছে খেয়াল নেই মালেকের। মোল্লার পেছন পেছন অন্ধের মত জুলেখার নির্দেশে গাড়ী ছুটিয়ে দিয়েছিল সে। মোল্লা হাইওয়ে ৪০১ এ উঠল, পশ্চিম মুখে, মন্ট্রিয়লের দিকে। পাগলের মত গাড়ি চালাচ্ছিল মোল্লা। স্পিড লিমিটের অনেক উপরে। মালেক সাবধানী ড্রাইভার। ক্লিন রেকর্ড। কিন্তু জুলেখা যখন তার দিকে তাকিয়ে কর্কশ স্বরে বলল, "ওকে ধর। জোরে চালাও" তখন সে সম্মোহিতের মত তার নির্দেশ মেনে নিয়ে গাড়ীর গতি অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। ঘন্টায় এক শ' পঞ্চাশ কিলোমিটারের উপর গতি উঠে গেল ওর। সে জানে ধরা পড়লে পুলিশ গাড়ী সহ তাকে জেলে নিয়ে তুলবে। কিন্তু জুলেখার নির্দেশ সে অমান্য করতে পারল না। জুলেখা নাকি চাঁদনী? তার মাথা আদৌ কাজ করছে না। ভৌতিক ব্যাপার স্যাপারে তার আদৌ বিশ্বাস নেই। সুতরাং মোল্লার কর্মকার্য তার কাছে সম্পূর্ণ বানোয়াট মনে হয়েছে। কিন্তু জুলেখার মধ্যে যে তার দেখা নরম-সরম, মায়াবতী মেয়েটা ছাড়াও আরেকটা কঠিন, রাগী এবং মারমুখি সত্বা আছে, সে ব্যাপারে তার সন্দিহান হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই সত্বা থেকে জুলেখাকে কি করে রক্ষা করা যায়? সাইকিয়াট্রিস্টরা কি ওকে সাহায্য করতে পারবে না?

এতক্ষন নিঃশব্দে গাড়ী চালিয়েছে মালেক। তার পাশে বসে বেশ কিছুক্ষন আপন মনে গজরিয়েছে জুলেখা, তার অস্বাভাবিক কর্কশ, উগ্র কণ্ঠে। মোল্লাকে পেলে সে ছিড়ে ফেলবে। জমিনকে না ছাড়লে মোল্লার বেঁচে থাকার কোন দরকার নেই। তারপর নীচু গলায় কিছুক্ষন কাঁদল। মালেক কি বলবে বুঝতে পারে নি। যে মেয়েটি তার পাশে বসে আছে, তাকে সে চেনে না। তার সাথে বলার মত কোন কথা তার নেই। সে আশায় আশায় আছে, হয়ত রাগ পড়ে গেলে জুলেখার আসল সত্বা বেরিয়ে আসবে।

ব্রকভিল পেরিয়ে গেল ওরা। মাঝারী আকারের একটা শহর। রাস্তায় এখনও অনেক গাড়ী। ৪০১ ব্যাস্ত হাইওয়ে। মোল্লা সামনেই কোথাও আছে। কতখানি এগিয়ে আছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কে জানে এদিকে কোথায় চলেছে সে? মালেক কোন বিপদে পড়বে নাতো?

গাড়ীর স্পিডোমিটারে চোখ গেল মালেকের। একশ ষাট। এদিকটাতে রাস্তায় হাইওয়ে পেট্রল কম। ধরা খাবার সম্ভাবনা কম। মোল্লা খুব সম্ভবত আরোও জোরে চালাচ্ছে কারণ তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। রাস্তায় সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে সে। দূর থেকে কোন পেট্রল কার দেখলে স্পীড কমিয়ে দেবে। অনেক সময় পুলিশ লুকিয়ে থাকে। প্রায় মিনিট পনের বিশ কোন কথা কিংবা শব্দ করে নি জুলেখা। তার দিকে ঝট করে একবার তাকাল মালেক। খুব শান্ত মুখে নিজের আসনে বসে সোজা সামনের অন্ধকার রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে সে। "জুলেখা!" সে আস্তে আস্তে ডাকল।

"হু," জুলেখা মৃদু গলায় উত্তর দিল। "ভয় পেও না। আমি জুলেখা।"

"চাঁদনী কোথায়?" দ্বিধা ভরে জানতে চাইল মালেক।

"আছে, আমার সাথেই আছে। এখন চুপচাপ আছে। ইচ্ছে হলেই আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।" একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল জুলেখা। "আমার শরীর, মন আর আমার নিয়ন্ত্রনে নেই। চাঁদনী সব দখল করে নিয়েছে। চাইলেও ওকে আমি থামাতে পারি না। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার মধ্যে যেন দুইটা মানুষ বাস করছে। দু' জন সম্পূর্ণ দুই রকম। শুধু একটা মিল আছে। আমরা দু জনাই খুব রোমান্টিক।"

"ঠিক বলেছিস!" একটা কর্কশ কণ্ঠ হঠাৎ কথা বলে উঠল। চমকে উঠল মালেক। চাঁদনীর

গলা।
"এখন আমি কথা বলছি। তুই চুপ কর," জুলেখা চাঁপা গলায় বলে, তার স্বাভাবিক, সুললিত কণ্ঠস্বরে।
মালেকের শরীর ছমছম করে ওঠে। অন্ধকার গাড়ীর মধ্যে একটি মানুষের শরীর থেকে দুটি অস্তিত্বের এই কথপকথন তার কাছে অজাগতীয় মনে হচ্ছে।
মালেক ফিসফিস করে বলল, "জুলেখা, আমি কি থামব? এভাবে আর কতক্ষণ যাবো?"
উৎকট গলায় ধমকে উঠল চাঁদনী, "চুপ করে গাড়ী চালা! মোল্লাকে ধরতে না পারলে তোর ঘাড় ভাঙব আমি।"
জুলেখা তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করল, "খবর্দার ওর গায়ে হাত দিবি না তুই!"
চাঁদনী গর গর করে উঠল। "শুধু নিজের কথা ভাবছিস? আমার জমিনের কি হবে? ঐ শয়তানটার হাত থেকে ওকে আমার বাঁচাতেই হবে।"
জুলেখা চাঁপা স্বরে বলল, "জমিন!জমিন!জমিন! তোর জন্য আমার জীবনটা শেষ হল। তোর জন্য বাশার মরল। আমার বাবা মা কে মারলি। আমার সংসার ভাঙল। একটা বুড়া মানুষকে বিয়ে করলাম। আর কত জ্বালাবি তুই আমাকে?"
এবার গর্জে উঠল চাঁদনী, "সব ভুলে গেছিস তুই? মনে আছে, ছোট বেলায় তোকে সবাই বলত পাগলী। একা একা ঘুরে বেড়াতিস। তোকে দেখলে সবাই হাসত। তখন আমি তোর বন্ধু হয়েছিলাম। আমি তোর সাথে খেলতাম, গাছে চড়তাম, সাঁতার কাটতাম, মাছ ধরতাম। কেউ তোকে খারাপ কিছু বললে তাকে ধরে এমন পেটাতাম যে ভয়ে কেউ তোর কাছে পর্যন্ত আসত না। ভুলে গেছিস সব?"
জুলেখার গলাও চড়ল এবার। "তুই ভুলে যাস না সারাজীবন ধরে তুই যা চেয়েছিস তাইই হয়েছে। বাশারের সাথে আমার কিচ্ছু ছিল না, তারপরও তোর জমিনের জন্য তার সাথে দিনের পর দিন চাঁদনী রাতে বনে জঙ্গলে গিয়ে অভিসার করেছি। সারা গ্রামের মানুষ জেনে গেল। আমার বাবা মায়ের কত অপমান হয়েছিল তুই জানিস?"
চাঁদনী চীৎকার করে বলল, "জমিনকে ঐ শয়তানটার হাতে কারা তুলে দিয়েছিল? কি দোষ ছিল ওর? আমাকে ভালোবেসেছিল?"
জুলেখার গলায় রাগ এবং ক্ষোভ। "সেই জন্য তুই তো তাদের শাস্তি দিয়েছিস। জীবন দিয়ে তাদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছে তারা। তোর জমিন তো বেঁচে আছে। অথচ জমিনের জন্য বাশার নামের একটা সরল ছেলের জীবন শেষ হয়েছে। তার জন্য তোর একটু খারাপ লাগে না?"
দাঁতে দাঁত চেপে উত্তর দিল চাঁদনী, "তোর মত এতো দরদী প্রাণ না আমার। আমি পাষান, আমি স্বার্থপর। হয়েছে এবার? আমার ভালোবাসার লোকটাকে আমার চাই। নইলে কাউকে শান্তিতে থাকতে দেব না।"
জুলেখা ফোঁস করে উঠল, "চাই না তোকে আর আমি। যা, চলে যা। আমার ভেতরটা কুরে কুরে খেয়েছিস তুই। আর না। বের হয়ে যা।"
চাঁদনী খেঁকিয়ে উঠল, "এখন তোর দরকার নেই বলে আমাকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিবি আর আমি চলে যাব? কোথাও যাব না। কি করবি তুই? তোর ক্ষমতা আছে আমাকে তাড়ানোর?"

জুলেখার কণ্ঠে এবার রাগের চেয়ে কাকুতি ঝরে পড়ে। "চাঁদনী, বন্ধ কর এই পাগলামি। ভুলে যা জমিনকে। চল, বাড়ী ফিরে যাই। মালেকের কোন ক্ষতি হলে আমি তোকে ছাড়ব না।"
মালেকের দিকে তাকিয়ে ভয়ংকর গলায় হুংকার দিল চাঁদনী, "গাড়ী যদি থামে, তুই মরবি। মোল্লাকে খুঁজে বের করতেই হবে। যত দিনই লাগুক।"
জুলেখা কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দ থেকে খুব ঠান্ডা গলায় বলল, "চাঁদনী, তুই আমার ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছিস।"
তাকে ভ্যাংচাল চাঁদনী। "তোর ধৈর্যের আমি থোড়াই কেয়ার করি। আমার উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই। চুপ করে থাক।"
একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল জুলেখা। একটা হাত রাখল মালেকের হাতে। "এই কটা দিনেই তোমাকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছিলাম। আমাকে ভুলে যেও না।"
মালেক জুলেখার দিকে তাকাল। "জুলেখা, আশা ছেড় না। চাঁদনীকে তুমি হারাতে পারবে। আমি আছি তোমার পাশে।"
মাথা নাড়ল জুলেখা। "পারব না। ওর অনেক ক্ষমতা। আমার সাধ্য নেই ওর হাত থেকে মুক্তি পাবার। জমিন মুক্তি পেলেও চাঁদনী আমাকে ছেড়ে যাবে না।"
সামনেই একটা বাঁক। পর পর বেশ কয়েকটা ট্রাক আসছে উলটো দিক থেকে। রাস্তায় চোখ রাখল মালেক। এতো গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে, সামান্য মনযোগ হারালে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া খুবই সম্ভব।
ঘটনাটা ঘটল এক লহমার মধ্যে। এমন কিছু ঘটতে পারে কল্পনাতেও ভাবে নি মালেক। হঠাৎ তার গালে এক ঝলক বাতাসের ঝটকা লাগতে পাশ ফিরে জুলেখার দিকে তাকাল সে, বিস্ফোরিত চোখ মেলে দেখল নিজের বেল্ট খুলে ফেলেছে জুলেখা; দরজা খুলে চোখের পলকে গাড়ির বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। মুহূর্তের জন্য সব ভুলে গেল মালেক, এক হাত বাড়িয়ে জুলেখাকে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করল, পারল না। তার গাড়ী ভারসাম্য হারিয়ে বিপরীত দিকে থেকে এগিয়ে আসা একটা ট্রাকের শরীর লক্ষ্য করে ছুটে গেল। ট্রাকের মাঝবয়েসী, মহিলা ড্রাইভার চেষ্টা করল সংঘর্ষ এড়ানোর কিন্তু লাভ হল না। প্রচন্ড জোরে ট্রাকের শরীরে আছড়ে পড়ল মালেকের গাড়ীটা, পরমুহূর্তে দুমড়ে মুচড়ে রাস্তার পাশের অগভীর খাদে ছিটকে পড়ল। এয়ারব্যাগটা খুলে গিয়ে মালেকের মাথাটাকে গুড়িয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করলেও ধাক্কায় ইঞ্জিনের একটা অংশ সামনে এগিয়ে এসে তার পায়ের নিম্নাংশের হাড় ভেঙে দিল। জ্ঞান হারাল সে।

ট্রাক ড্রাইভার কড়া ব্রেক কষে ট্রাকটাকে রাস্তার পাশে দাঁড় করাতে সক্ষম হল। লাফিয়ে নীচে নেমে এলো সে। দলা মলা পাকানো ধাতব গাড়ির ধ্বংশাবশেষ দেখেই সে বুঝল গাড়ীর যাত্রীদের জীবনের আশংকা আছে। সাথে সাথে পুলিশে ফোন করল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই প্রথম পুলিশের গাড়ী এসে হাজির হল। পরবর্তি পনের মিনিটের মধ্যে আরোও তিনটি পুলিশের গাড়ী এবং দুটি ফায়ার ট্রাক এসে গেল। রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হল দু'দিকেই। গাড়ীর ছাদ কেটে সংজ্ঞাহীন মালেককে বের করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। প্রায় ঘন্টা খানেক পর দুর্ঘটনার স্থান ভালো করে পর্যবেক্ষন করতে গিয়ে একজন

পুলিশ কনেষ্টবল আবিষ্কার করল একটি তরুণী মেয়ের মৃত দেহ। দুর্ঘটনার স্থান থেকে প্রায় তিন শ গজ দূরে।

মিজান তার লিভিংরুমে জড়সড় হয়ে বসে আছে। তার মুখে ব্যান্ডেজ বাঁধা। এক পাশে বসে আছে রহমত, অন্য পাশে জিনিয়া। তাদের মুখোমুখি সোফায় বসে আছে বেশ লম্বা, সুট প্যান্ট পরিহিত একজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক। তার নাম পিটার হাওয়ার্ড। সে স্থানীয় পুলিশ ডিপার্টমেন্টের একজন ডিটেকটিভ সার্জেন্ট। তার হাতে একটা নোটবুক এবং কলম। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু তথ্য লিখে রাখছে সে।

"আপনার ছেলের অবস্থা এখন কেমন?" পিটার সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

"ভালো," মৃদু কণ্ঠে বলল মিজান। "ওর পায়ের অপারেশন হয়েছে। স্টেবল।"

"আমি গতকাল দেখতে গিয়েছিলাম," পিটার বলল। "খুবই দুঃখজনক। কিন্তু পুরো ঘটনাটা আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। আপনি বলছেন আপনার স্ত্রীর উপর ভুতের আছর ছিল। ব্যাক্তিগতভাবে আমি ওসবে বিশ্বাস করি না কিন্তু আপনাদের কথা যদি মেনেও নেই, আপনার স্ত্রীর এভাবে আপনার ছেলে মিস্টার মালেকের সাথে বেরিয়ে যাবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছে না।"

জিনিয়া বিরক্ত কণ্ঠে বলল, "ডিটেকটিভ, তোমাকে তো আমরা সবই বলেছি। মোল্লা যখন পালিয়ে যায়, জুলেখা তার পিছু নেয়। আমার ভাই জুলেখার পিছু নেয়। তারপর সে জুলেখাকে নিয়ে মোল্লাকে অনুসরণ করে। মাইকও তোমাকে একই কথা বলেছে।"

মাথা দোলাল পিটার। "তার কথার কতটুকু মূল্য আছে, সন্দেহ। সে তো অর্ধেক দিন মাতালই থাকে মনে হল। যাইহোক, সমস্যা হয়েছে, এই মোল্লা লোকটাকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। তার গাড়ীর লাইসেন্স নাম্বার তোমরা আমাকে দিতে পার নি। তার যে আমেরিকান ঠিকানা দিয়েছ সেটা একটা মসজিদের ফোন নাম্বার। ফোন করেছিলাম, কিন্তু কোন উত্তর পাই নি। আবার চেষ্টা করব।"

রহমত বলল, "আমরা তোমাকে মিথ্যা বলছি না। ওখানে ফোন করেই আমি তার সাথে প্রথম যোগাযোগ করি। হোটেলে খবর নিলেই জানতে পারবে মোল্লা সেখানে দু রাত ছিল।"

পিটার সমঝদারের মত মাথা দোলাল। "খোঁজ নেব। আমার আসল চিন্তা হচ্ছে ওর নিরাপত্তা নিয়ে। তোমাদের কথা আমি অবিশ্বাস করছি না। তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলছে। আচ্ছা, পুলিশ খোঁজাখুঁজি করছে। পেয়ে যাব।"

রহমত বলল, "জুলেখার লাশ আমরা কবে পাব? তাকে কবর দিতে হবে।"

"পোস্ট মর্টেম হবে, তার পর পাবে। কয়েক দিন লাগতে পারে। আচ্ছা, মিসেস জুলেখাকে কি তোমরা ডক্টর এলানের কাছে নিয়ে গিয়েছিলে?" পিটার জানতে চাইল।

মাথা দোলাল মিজান। "হ্যাঁ। তুমি কি করে জানলে?"

পিটার নোট বই খুলল। "ফোন করেছিল। তোমাদের উচিৎ ছিল আমাকে আগেই জানান। যাই হোক, কাগজে খবরটা পড়ার পর সে নিজেই ফোন করে আমার খোঁজ করে। তার মুখেই শুনলাম, তোমার স্ত্রীর মানসিক অসুখ ছিল। ডি-আই-ডি, ডিসোসিয়েটিভ আইডেন্টিটি ডিসর্ডার। তোমাদের উচিৎ ছিল আবার তার কাছে নিয়ে যাওয়া। এইসব ভুতের ওঝাদেরকে বিশ্বাস করাটা ঠিক নয়। তোমার স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য সেই হয়ত দায়ী, যদিও গাড়ী

থেকে তার লাফিয়ে পড়ার ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না। পোস্ট মর্টেম হলে আরো ভালো করে বোঝা যাবে। ”
পিটার উঠে দাঁড়াল। “আমাকে যেতে হবে এখন। দয়া করে কয়েকটা দিন টরন্টো ছেড়ে কেউ বাইরে যেও না। আসি।”
রহমত গেল পিটারকে এগিয়ে দিতে। সে ফিরে আসতে জিনিয়া বলল, “মোল্লা কোথায় গেল?”
রহমত শ্রাগ করল। “জানি না। হয়ত আমেরিকা ফিরে গেছে। আমি ভাবছি, চাঁদনীর কি হল?”
জিনিয়া চাঁপা গলায় বলল, “জুলেখার সাথে সেও কি মারা গেছে?”
রহমত মাথা নাড়ল। “বলার কোন উপায় নেই। কিন্তু মৃতদেহের মধ্যে তারা আছর করতে পারে না, যদি সে বেঁচেও গিয়ে থাকে, অন্য কোন জীবিত মানুষের শরীরকে বেছে নিয়েছে।”
মিজান একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে দুই হাতে নিজের মুখ ঢাকল। বিড়বিড়িয়ে বলল, “জুলেখার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। নিষ্পাপ একটা মেয়ে, এভাবে চলে গেল।”
জিনিয়া বাবার পিঠে আলতো করে হাত রেখে সান্তনা দেবার চেষ্টা করল। কিছু বলল না।

এক মাস পর।
মালেক হাসপাতাল থেকে তার বাবার বাসায় এসে উঠেছে। জিনিয়া সেখানেই ছিল। মিজানের এই অবস্থায় সে তাকে একা ফেলে চলে যেতে চায় নি। মালেকের দুটি পা-ই হাঁটুর নীচে ভেঙ্গে যায়। অপারেশন করে প্লাস্টার লাগানো হয়েছে। অন্তত মাস খানেক বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। সারাদিন বিছানায় শুয়ে সে শুধু জুলেখার সাথে তার কয়েকটি অসম্ভব সুখময় দিনের কথা স্মরণ করে। কেউ সামনে না থাকলে নিঃশব্দ কাঁদে। জুলেখার গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ার দৃশ্যটা সে মানশ্চক্ষে বার বার দেখে। পাশে বসে থেকেও সে তাকে বাঁচাতে পার নি। এই অপরাধ বোধ থেকে সে কি করে পরিত্রাণ পাবে?

একটা চিঠি এলো মেইলে। উপরে লেখা ‘মিজান পরিবার’। কোন ফিরতি ঠিকানা নেই। মিজান, মালেক এবং জিনিয়ার সামনে খাম খুলে চিঠিটা বের করল। তার কেন যেন মনে হয়েছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি। একা একা খোলার সাহস হয় নি। সাদা পৃষ্ঠায় বল পেন দিয়ে লেখা কয়েকটা লাইন। নীচে বড় বড় করে লেখা ‘চাঁদনী’। চিঠিটা হাতে নিয়ে পড়তে গিয়েও জিনিয়ার হাতে তুলে দিল মিজান। তার শরীর কাঁপছে। জুলেখা নেই কিন্তু সেই অভিশাপটা এখনও বেঁচে আছে। এই সম্ভাবনার কথা তাদের সবারই মনে হয়েছে কিন্তু কেউ বোধহয় ভাবে নি সেটাই সত্যি হয়ে যাবে। জিনিয়া জোরে জোরে পড়ল...
আমার নতুন বন্ধু হয়েছে বেটসি। বয়েসটা একটু বেশী কিন্তু ভীষণ সাহসী। বিশাল ট্রাক চালায়। জুলেখার মত নরম সরম না। জুলেখা এমন একটা কাজ করবে, চিন্তাও করি নি। বেটসিকে না পেলে সেই রাতে ওর সাথে আমারও সমাপ্তি হত। সেটাই চেয়েছিল জুলেখা। এতো বছরের বন্ধুত্ব! কে জানত এভাবে শেষ হবে। ওর কথা খুব মনে পড়ে। ও ছিল

আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু।
ভালো থেক তোমরা।
বিঃদ্রঃ মোল্লাকে খুঁজে পেয়েছি। জমিনকে সে ছেড়ে দিয়েছে। তাকে নিয়ে কি করব জানি না। ভাবছি।

হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল মিজান। "জুলেখা চলে গেল, আর শয়তানীটা বেঁচে গেল! ও কি আবার এখানে ফিরে আসতে পারে?"

জিনিয়া ভ্রু কুঁচকাল। "এখানে কেন আসবে? জমিনকে তো পেয়েই গেছে। মোল্লাকে নিয়ে কি করবে মনে হয়?"

মিজান কাঁধ ঝাঁকাল। "আল্লাই জানে। আমদের কি পুলিশে খবর দেয়া উচিৎ? কিন্তু কে এই বেটসি? চিঠিতে কোন ঠিকানাওতো নেই।"

মালেক গম্ভীর গলায় বলল, "যে ট্রাকটার সাথে আমার এক্সিডেন্ট হয়েছিল, তার ড্রাইভার ছিল বেটসি।"

মিজান এবিং জিনিয়া দু'জনাই প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে, যেন জানতে চাইছে, এখন তাদের কি করণীয়। মালেক চাঁপা স্বরে বলল, "ডিটেকটিভ পিটারকে একটা ফোন দাও। চিঠিটা হাতে পেলে যা করার সেই করবে।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল জিনিয়া। তাদেরকে চিঠি পাঠানোর কি দরকার ছিল চাঁদনীর? ডিটেকটিভ পিটারকে এই চিঠি দিলে সে বেটসিকে খুঁজে বের করবেই। যার অর্থ, চাঁদনীর হাত থেকে তাদের নিস্তার নেই।